অহৈতুকী নিসর্গগুচ্ছ

বিপ্লব নায়ক

অহৈতুকী নিসর্গগুচ্ছ
বিপ্লব নায়ক

অহৈতুকী নিসর্গগুচ্ছ

অহৈতুকী নিসর্গগুচ্ছ

বিপ্লব নায়ক

অন্যতর পাঠ ও চর্চা

কথা ও রেখার কোলাজ
রচনাকাল: ২০২১, ২০২২

বর্ণসংস্থাপন ও গ্রন্থনির্মাণ: লেখক

প্রথম মুদ্রণ: ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

প্রকাশক
অন্যতর পাঠ ও চর্চা
১২৫, রাজা সুবোধ চন্দ্র মল্লিক রোড
কলকাতা– ৭০০০৪৭

মুদ্রণ
ডি অ্যান্ড পি গ্রাফিকস প্রা. লি.
১৪৩, ওল্ড যশোর রোড, গঙ্গানগর
কলকাতা– ৭০০১৩২

লেখকের পরিচিত কয়েকজন পাঠকের জন্য,
তাই কোনো নির্দিষ্ট বিনিময় মূল্য নেই

উৎসর্গ

সেই সমস্ত কাকতালীয়তাকে
যা আমায় নির্মাণ করেছে ও করে চলেছে

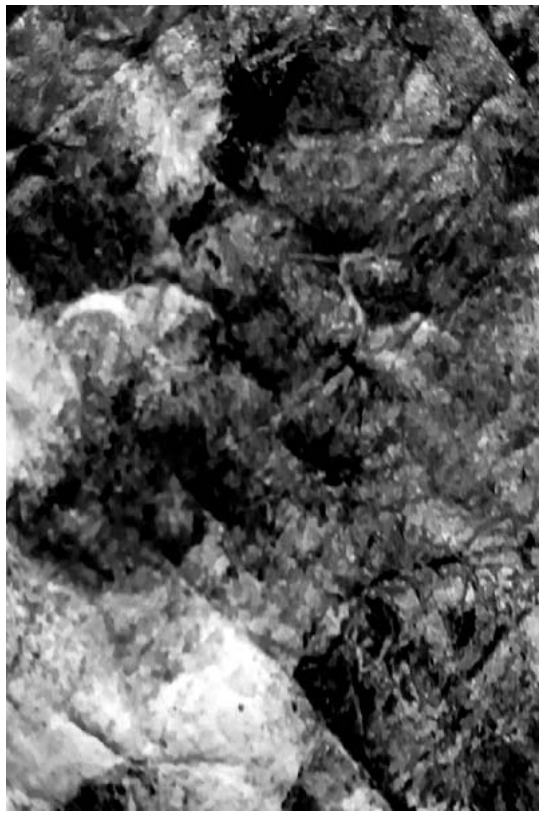

কেবলমাত্র সেই শব্দগুলোতেই কিছু যায়-আসে, সেই শব্দগুলোই ছোঁয়াচে, যেগুলোর জন্ম উদ্ভাসে বা প্রকোপে, অর্থাৎ, সেই দুই অবস্থায় যখন আর নিজেকে চেনা যায় না।

— এমিল সিওরান, *ড্রন অ্যান্ড কোয়ার্টার্ড*

সূচী

	অবতরণিকা	১১
নিসর্গ ১:	সঞ্জয়ভাষ্যে ইতিহাস	১৪
নিসর্গ ২:	অবয়বারতি	১৭
নিসর্গ ৩:	নাম	২০
নিসর্গ ৪:	অলস কীটের কল্পনা	২৩
নিসর্গ ৫:	অনিবার্য	২৫
নিসর্গ ৬:	যাত্রাবিবরণ	২৭
নিসর্গ ৭:	আষাঢ়ে গল্প	৩০
নিসর্গ ৮:	ঘাতকের চোখের মতো	৩২
নিসর্গ ৯:	যখন ঘৃণা সহজ	৩৫
নিসর্গ ১০:	ইন্দ্রদুহিতা ও আমি	৩৭
নিসর্গ ১১:	স্বগতোক্তি	৪০
নিসর্গ ১২:	বিষাদ অকারণ	৪৩
নিসর্গ ১৩:	বিপাক	৪৫
নিসর্গ ১৪:	হেঁটমুণ্ড	৪৮
নিসর্গ ১৫:	পূর্বপ্রেম	৫০
নিসর্গ ১৬:	বিস্মরণের স্মৃতিই গভীরতম	৫২
নিসর্গ ১৭:	আবাস	৫৪
নিসর্গ ১৮:	একটি মৃত্যুর পর	৫৬
নিসর্গ ১৯:	নদী আজ	৫৯
নিসর্গ ২০:	পতন	৬১
	নিষ্ক্রমণ	৬৩

অবতরণিকা

একদা তীক্ষ্ণ স্পষ্ট আলো ধারালো পরিলেখে বস্তুদের হাজির করত। পরিবেশে ছিল যন্ত্রাধিক্য। পথ ছিল বাঁধা। স্বর্গে পৌঁছানোর অনিবার্যতা নিয়ে সংশয় ছিল না। বেশ কিছু বাঁক পেরিয়ে পরিপার্শ্ব এখন পাল্টে গেছে। ধূসর গোধূলিশেষে এখন আলোর চেয়ে অন্ধকার বেশি। অন্ধকারের কণাগুলো অজ্ঞেয় কোনো সুড়ঙ্গের প্রবেশমুখ। সেইসব সুড়ঙ্গ নিশ্চয়তাকে দ্রবীভূত করে সদাপরিবর্তমান আকারে বিমূর্ততা উৎপাদন করতে করতে অনন্তে প্রসারিত। পরিলেখহীন বস্তু সামান্য অংশকে অনন্ত গভীর করে তুলেছে। মুহূর্ত অনেকান্ত, পথ বিসর্জিত।

গৌরব অর্জনের কাঙালপনা অস্ত গেছে, 'সুখ'-ই শেষতম অবশিষ্ট পূর্বসংস্কার। সুখ এখনও প্রলুব্ধ করে, আর সেই লোভ থেকেই আশাবাদের জন্ম ও স্ফূর্তি। সুখ হাসিল করার বিস্তারিত আয়োজনে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের মতো আত্মসমর্পণ করে মূঢ় পরিহাসে পৌঁছানো ছাড়া আর কোনো অমিতাচার আমাদের সাধ্যে নেই। সবাই যদি ভীরুতা ও জড়তার একই মাত্রায় এসে উপনীত হয় তাহলে সর্বজনীন নিরাপত্তাহীনতা যে কাপুরুষোচিত সন্ধির জন্ম দেয়, সেই সন্ধিই আপাতত একমাত্র সামাজিক সম্পর্ক।

আয় মন বেড়াতে যাই। ডুব দিই মৌল ঘূর্ণির আদিম অরাজকতায়। যেখানে আকার জন্ম নেয়নি। প্রগতির যত অক্ষৌহিনী যুগের পর যুগ এখানেই সমাধিস্থ হয়েছে। পাগলপনার সেই আগুনখাদে কেঁপে উঠুক বর্তমানতা। সবকিছু মুছে যাক আর অস্থির প্রকোপ আমাদের ভাসিয়ে নিক আদি বিশৃঙ্খলা থেকে চূড়ান্ত শূন্যতা অবধি। শূন্যতামধ্যে সদ্যজাগ্রত উদ্বেগ সূচনার উৎকণ্ঠায় শিহরিত হোক।

চতুষ্পার্শ্বে গোটা বিশ্বের ধ্বংসযাত্রাই যেহেতু আমরা দেখেছি, আমাদেরও ধ্বংসের দিকে যাত্রা করা ছাড়া গতি কী ? নিরাশার এই অভিকর্ষ কাটিয়ে অনাশাচারী হওয়া শ্রেয় । সময়কে লঙ্ঘন করার মুহূর্তটিতে যাপন বাঁধা যাক । সে মুহূর্ত অসীম, অথচ সে আত্মহননেরও মুহূর্ত ।

যন্ত্রণা এখানে বেদনার মতো গাঢ়, নিলাজ উচ্চাভিলাষী । অস্তিত্ব কেবলই নকলনবিশি । মরণ, শ্যামসম, পূর্ণতার একমাত্র প্রতিমা ।

ফাটল, চকিত পতন ও ভঙ্গুর পরিলেখ এবড়োখেবড়ো কদাকার ভাষায় এক ফিরে আসার কথা বলে, এক আত্মনেপদী ফিরে আসা, যা ভাঁজ খেয়ে নিজ সীমাগুলোকে প্রশ্ন করে, যেনবা নীরন্ধ্র রাত্রির গহন শূন্যতা থেকে উৎসারিত এক শীর্ণ আলোকরেখা পাক খেয়ে খেয়ে যাকে ছোঁয় তাকেই শূন্যতা থেকে তুলে এনে শূন্যতায় বিসর্জন দেয় ।

এ যাত্রার কুড়িটি নিসর্গ অতএব বর্ণন করি, কিছু শব্দে, কিছু অন্ধকারে ।

নিসর্গ ১:
সঞ্জয়ভাষ্যে ইতিহাস

নিষ্পত্র ডালের জ্যামিতিতে আটকে ক্ষয়া চাঁদ
বেদনার ছায়া অকম্প
চাতক বালিপাথর খাদে ঘুঙুর-নদীর স্মৃতি চাউর
আর কল্পসুখ-মাপজোখের স্তোত্রকীর্তন ভাসে
বারুদগন্ধী বাতাসে

আমাদের যাপন এখানে অনিকেত

গাছের বাকলে প্রস্তরিত ক্ষতচিহ্নে
শত শতাব্দীর হিংসা-বদলা
অন্ধ চোখে চেয়ে আছে অনিবার্য কুরুক্ষেত্রের দিকে
ধারালো ইস্পাত-ফলার ঝলকানিতে
পূর্বজ মুখের আদল খোঁজে যুধিষ্ঠির
ধ্বংসচিহ্নিত গাছেদের পাড়ায়
স্বর্গারোহিণী পথে

মেটে বাদামি লালচে অথবা ছাইরঙা চরাচরে
দহনচিহ্নের ঘন কালো আঁকিবুঁকি মাঝে
বেমানান দাঁড়িয়ে মাত্রিকতা ভাঙা দাম্ভিক মিনার
অপার্থিব আলোয় ঝলসানো
মৃত্যুঞ্জয়ী নির্মিতি-নিদর্শন

এ মিনার ঘিরে কল্পস্বর্গরাজ্য গড়ে ওঠার কথা ছিল

অথচ বহুবার ভিতপুজোর পর
নির্মাণসমাপ্তির কাল বহুবার পার হয়ে যাওয়ার পর
এখনও কেবল ধ্বংসের ছড়াছড়ি
আর আমাদের যাপন এখনও অনিকেত

নিসর্গ ২:
অবয়বারতি

অন্তরস্থ আগুন ও অন্ধকারের মন্থনজাত বোধ
অনায়াস রূপ থেকে
ক্রমশ আমাদের আয়াসসাধ্য হয়ে উঠে
সময়ে গ্রথিত হয়
ঘটনাকে সাক্ষী মানে
লোকোত্তর মতবাদের রণসাজে সাজে
প্রাণ-নিঙড়ানো খেলার হিংসায় নিজ শক্তি মাপে

অতল গর্ভগৃহে খণ্ডস্বপ্ন আর অন্ধস্বার্থে নির্মিত দেবতা
ইতিহাসের গাধার পিঠে সওয়ার এক অনিন্দ্যকান্তি পুরুষ
শঙ্খ-চক্র-ক্ষেপনাস্ত্র-সজ্জিত এক মহাকালদ্রষ্টা
যুক্তি-প্রমাণ-অসম্ভবকল্পনার মিশেলে অনুপম
অতিকথা তার নৈবেদ্য
জ্ঞানের রঞ্জকে তেজস্কর তার প্রসাদ
মদীয় প্রবৃত্তির রন্ধ্রে রন্ধ্রে তার আবাহন

দেবকথায় আস্থা আমাদের অস্তিত্বের মোহর
অবিশ্বাসীদের নিয়ে উৎকণ্ঠায় জ্বলে অনির্বাণ যজ্ঞাগ্নি
জ্ঞানপ্রসাদী উড়ো খই বিলি হয় দেদার

কালগতিদ্রষ্টা রথের চাকায় অজ্ঞানী অপজাত্য পিষ্ট করে
অনাবেগ ইতিহাসচেতনায় দৃঢ় কর্তব্যপালনকারীরা
প্রত্যেকে এক একজন নির্ভার খুনী, তারাই অগ্নিহোত্রী

মতবাদী আফিমৌষধে অস্তিত্ব-যন্ত্রণা ফিকে হয়
জল আর আগুনের শিখা থেকে পুষ্টি শুষে
অপর জীবনকে শুধরে দেওয়ার নিমিত্ত
স্থবির তমসাগর্ভে গড়ে ওঠে সংস্কারক-অক্ষৌহিনী
বিদ্যালয় কারাগার রাষ্ট্রসভা ভক্তসভা পরোপকারসঙ্ঘে
ছড়িয়ে পড়া অক্ষৌহিনী
চতুষ্পার্শ্ব বদলানোর নিমিত্তে
নিবারণ করে তামাকের আড্ডা
এমনকি ভিখারিদের গা-ঘেঁষাঘেষি সন্ধ্যাযাপন
আর যুদ্ধবিরতির জ্যোৎস্নাপ্লাবনে
পরাজিত অপর-শবে খোদাই করে রাখে স্বপ্ন পরম

আমরা প্রত্যেকেই যেহেতু গর্ভগৃহ-দেবতার প্রচারক
তাই আমাদের প্রত্যেকেরই শত্রু আছে
শত্রুবিতাড়ন শত্রুনিধন কর্তব্য আছে
স্বপ্ন বাস্তব করার ধর্মযুদ্ধ আছে

যখনই দেখি মাচার কেদারা থেকে
কোনো ‘আমরা’-র প্রতিনিধি ‘পরম স্বার্থ’ ব্যাখ্যা করে
ভয় হয় অনায়াস খুনের তোড়জোড় এই পেকে উঠল বুঝি

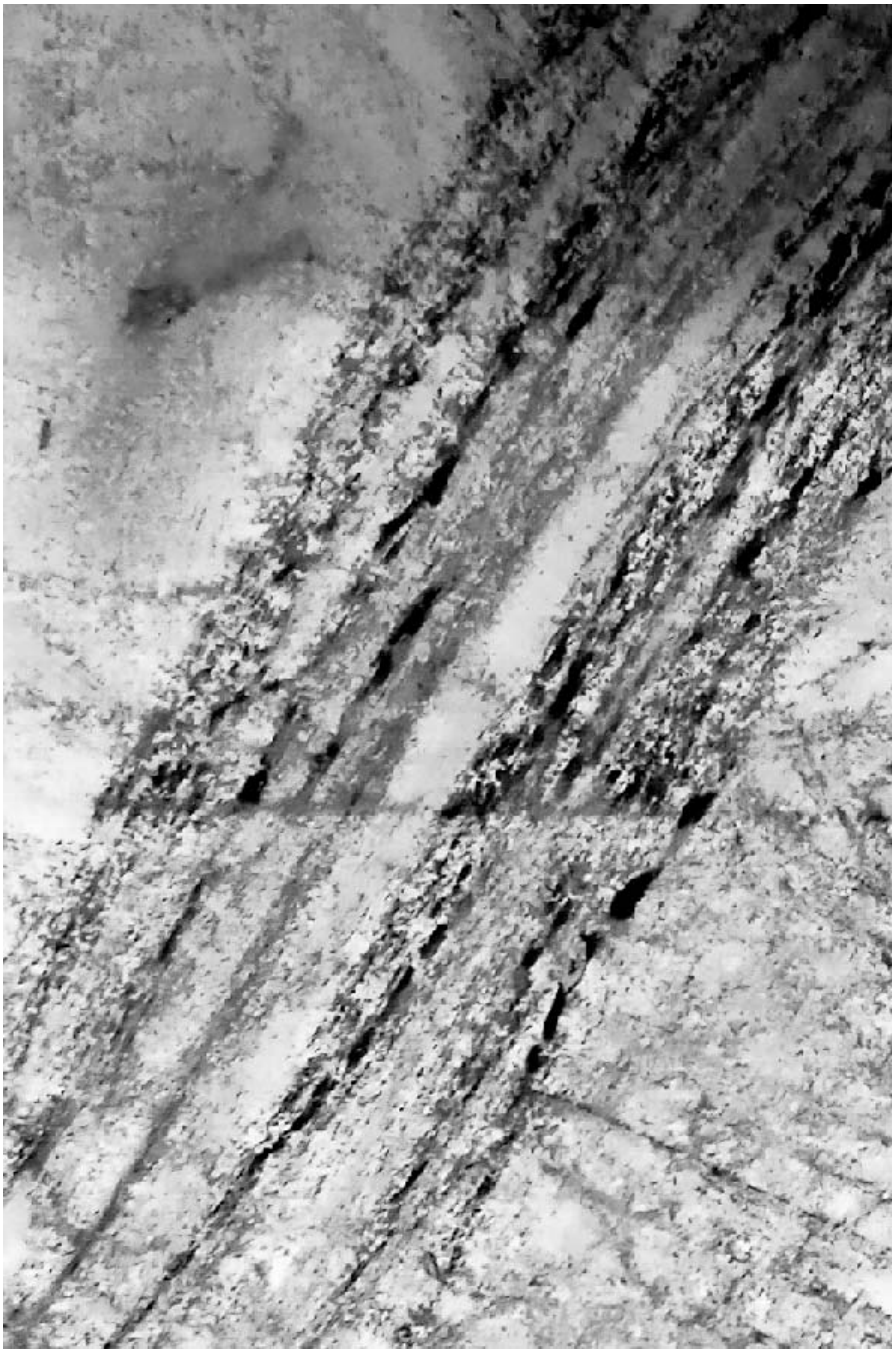

নিসর্গ ৩:
নাম

পালির পলি-পাত্রে
রঙ তুলি কলম কালি গুছিয়ে
প্রশ্নপত্র উত্তরপত্র পাশাপাশি রেখে
সোজা হয়ে বস একাগ্র বুদ্ধাসনে
উত্তরপানে যাত্রাপথ সসীমসংখ্যক
তাই সব পথই অধ্যবসায়ের নাগালে

খোঁয়াড়ে ফেলে আসা আধমরা ঘোড়ার
গাঁজলা ওঠা নাকমুখের কাঁপা শ্বাসে
অস্তিত্বের অস্বাচ্ছন্দ্য যেমন তির তির করে কাঁপে
তেমনই শিরদাঁড়ার মাঝে শিউরে ওঠে ভঙ্গুরতাবোধ
অস্থিমাংসে ছড়িয়ে পড়ে পচনানুভব

বিষয়ী হয়ে ওঠার জন্য একটা নাম বেছে নাও:
১।চিরায়ত ২।ক্ষণবিদ্য ৩।ন্যায়বত্তা ৪।বৈলক্ষণ্য

শ্বাসের সঙ্গে বেদনা পুড়ে খাক হয় রক্তের গভীরে
নাম গুলিয়ে যায়
বেদনা ঘিরে কেবল বিশেষণদের যাতায়াত
এক একটা বিশেষণ এক একটা সভ্যতা
তীব্রতার এক এক ধরন
মূর্খতা ও পাণ্ডিত্যের মধ্যে সুতোর পার্থক্যটাই যেন বিশেষণ
আমাদের অঞ্জলি দেওয়া বিশেষণ পেয়ে ঈশ্বর প্রাণধারণ করে

তবু আমরা বেদনায় স্বতন্ত্র হয়ে উঠতে চাই
উত্তরপত্রের উত্তর পিছু চাই জ্ঞানের স্বীকৃতি
আর নাম ঘিরে ভ্রাম্যমান বিশেষণগুলো শুকিয়ে আসে
বর্ণ গন্ধ হারায়
তার স্থবির শূন্যতাপঙ্কে নাম ডুবে যায়

ধরা যাক বেপরোয়া কেউ শব্দে ডুবে তল ছুঁতে গেল
কিছুই কি সে ছুঁতে পারবে?
বিস্তারমান উর্বর সেই প্রাণ কেবল শূন্যতায় লেত্তি-পাক খাবে না কি?
উলটে ধরা রাতের আকাশে ঝকমক করবে না কি প্রজ্ঞার গমক?

আমাদের প্রবাহিত জীবন শেষ হয়ে এল
নিঃশেষ ক্রমপরিণতি আর মহান বিদ্যমানতায়
নামবহনের ধূসর ক্লান্তিতে ছেয়ে যায় এ পলির চর

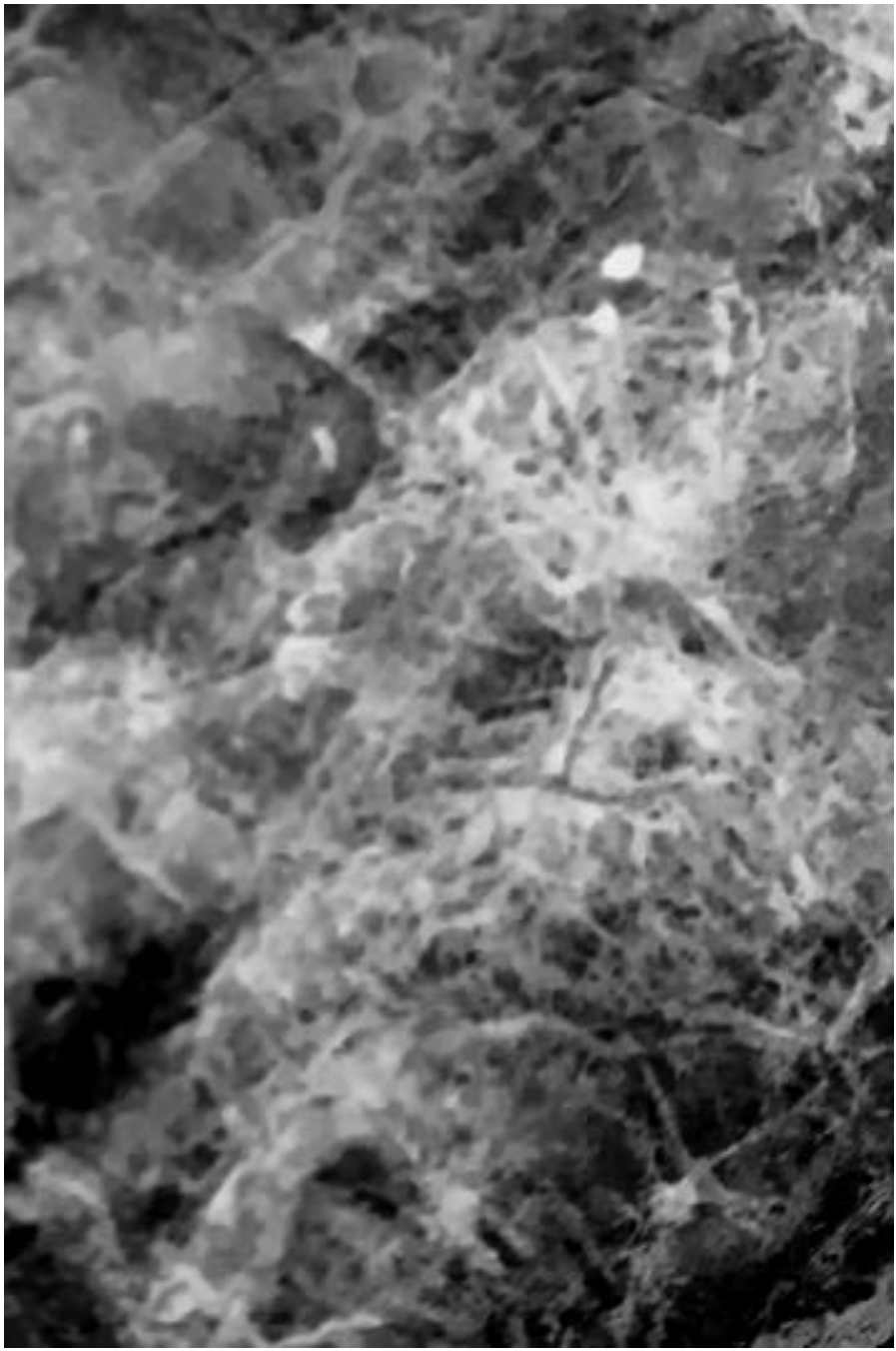

নিসর্গ ৪:
অলস কীটের কল্পনা

বাসনার উর্বর জমি ছেয়ে যায়নি অতিকথায়—
এমনও কি হতে পারে?
এমন একটি জীবনও কি হয়
যার উৎস ভ্রান্তি থেকে নয়?
কোনও প্রাণই কি এমন স্বচ্ছ সূর্যমুখী
যে গহন পাঁকে তার শিকড় বুদ্ধ-ধ্যানশীল?
কোনও ক্রিয়া কি এত স্বতোৎসারিত
যে নির্মিত অভিপ্রায় তার উপর ভর করেনা?
সূর্য যদি দহনহীন
দেবভক্তিহীন বিশ্ব যদি দেবদূতের জন্মভূমি
কেবলমাত্র সেই অন্তর্গত তমসাবেলায়
অলস কীটের কল্পনা এভাবে লিখে থাকে
পরিত্যক্ত অবিনশ্বর পৃথিবীর ইতিহাস।

নিসর্গ ৫:
অনিবার্য

লজ্জার মতো অপ্রকাশ্য এই এঁদো গলি
দুদিকে গর্ভকেশরের জড়াজুটি ঝুপড়ি
অংশত থ্যাঁতলানো মরা কুকুর, মরা ছুঁচো, মরা বিড়াল
নর্দমা ঘিরে ভনভন সবুজ মাছি
স্থপতি ও নৃপতিদের পেচ্ছাপ বুজকুড়ি কাটে
কসাই খোঁজে মাংস, মুচি খোঁজে চামড়া
শিশুরা ভয়ে ঘরের অন্ধকারে সেঁধিয়ে থাকে

রোগা মহিলাদের হাড়গিলে হাত বাসনের কালি চেঁছে
চোখ ঘিরে রেখা টানে, দাঁতে ঘষে,
শিশুদের কপালে টিপ পরিয়ে দেয়
এভাবেই তাদের পূর্বজরা অন্ধকারে মিশে যেতে পারত,
এখন চেষ্টা করেও এরা পারেনা

আয়নাগুলোই হাড়জিরজিরে
অন্ধকারেও হাড়ে এসে হাড় লাগে
দয়া করে বড় বড় মূর্তিগুলোর গল্প এখন বন্ধ কর
আমার আর সহ্য হচ্ছে না

এখানে ওখানে হলদে মরা ঘাসের চাঙড় ঘিরে
শীতল মৃত্যুস্পর্শের মতো তীব্র আলো অনন্ত ধৈর্য্যে ফাঁদ পেতে থাকে
আর দেরি নয়, কুঠুরিতে ঢোকো, গরাদ টেনে দাও

নিসর্গ ৬:
যাত্রাবিবরণ

মাপা পথের শেষে
উদাসীন বাড়ির কাঠচাতালে বসে
প্রভু বলেছিলেন:
চোখ আর চক্ষু এক নয়।
প্রভু সেখান থেকে ফিরে গিয়েছিলেন।
আমাদের বোঝাগুলো তোলা হয়েছিল রোগা ঘোড়ার পিঠে,
আমরা পাড়ি দিয়েছিলাম।
চক্ষু প্রজাপতির চোখ হয়ে
ফুলের রসভাণ্ডারের দরজা দেখতে পায়।
চক্ষু বহুরূপী গিরগিটির চোখ হয়ে
সবুজ প্রান্তরের এপার-ওপার দেখতে পায়।
প্রভু আমাদের চক্ষু দিয়েছেন,
তাই আমরা হাঁটতে হাঁটতে
পাথর-জল-লতা-গাছ
আর বিচিত্র সব প্রাণী ও মানুষের
অপচ্ছায়া ভেদ করে সত্যরূপ দর্শন করছিলাম
ছদ্ম আবরণের গভীরে নিহিত সত্য একমেবাদ্বিতীয়ম
অসার সমস্ত কিছু নির্বিশেষে পরম সার
প্রত্যেকেই সযতনে সেসব গুছিয়ে রাখছিলাম
ধুয়েমুছে পবিত্র করা নিজ অভ্যন্তরে
দিনশেষের প্রদর্শনীর জন্য।

দিনশেষে আরেক উদাসীন বাড়ির কাঠচাতালে বসে
নিভু আলোয় গুছিয়ে রাখা সত্যগুলোকে আমরা বের করলাম।

প্রভু বলে গেছেন
একমেবাদ্বিতীয়ম সত্যের পরম রূপ এক এবং অনন্য।
তবু আমাদের গচ্ছিত সত্যগুলো একে অপরের সঙ্গে মিললো না
বিরোধও বেধে বসল রীতিমতো
বিপর্যয়ের খাদ দেখা দিল অভ্যন্তরে।
তবে কি চক্ষুর অধিকারী হতে পারিনি আমরা!
প্রাণপণে নিভু আলো খুঁচিয়ে আগুন জ্বালিয়ে তুললাম,
নিজেকে ছাড়া প্রত্যেককে সন্দেহ হতে লাগল—
আমি ছাড়া আর সবাই পাকা ঠগ
চোখকে চক্ষু বলে চালাচ্ছে!
আমার চক্ষুধৃত সত্যকে মিথ্যা করতে চাইছে ভুয়ো সত্য দিয়ে!
এভাবে আমরা একে অপরের শত্রু হলাম
আর একে অপরকে হত্যা করতে উদ্যত হলাম।
উদাসীন মৃত্যু দিগন্ত ছেয়ে দিল।

নিসর্গ ৭:
আষাঢ়ে গল্প

পাথরে প্যাপিরাসে পাতায়
বা হাওয়ার কম্পনে
রূপক ও লক্ষণায়
নির্মিত সত্য
পড়তে পড়তে সে খুঁজছিল
শতাব্দীজোড়া অস্তিত্ব-বিপর্যয়কে
বর্ণনা করে
এমন শব্দ বা প্রতিমা

কিছুই খুঁজে না পেয়ে
সে আবিষ্কার করল
অতীত নিশ্চিহ্ন অপাঠ্য হিয়েরোগ্লিফের আড়ালে
ভবিষ্যতের ভার বয়ে ক্ষয়িত লুপ্তপ্রায় বর্তমান
আর সত্যগুলো সব তারিখ চলে যাওয়া বিজ্ঞপ্তি

নিসর্গ ৮ :
ঘাতকের চোখের মতো

গতায়ু আবর্জনার স্তূপে সূর্যকে ফেলে এসেছি
রাত এখন নিঃসংশয়
মাটিতে সঞ্চিত তাপ উবে যেতে যেতে উষ্ণতা মলিন
ইস্পাতের মিনারগুলো গা-ঘেঁষাঘেষি করে
বিজয়োৎসব পালন করছে
ঘাতকের চোখের মতো শীতল আলো বাজি হয়ে ফুটছে
যুক্তিপরম্পরার বাঁধানো রাজপথে ভিড় জমেছে বেশ

যুক্তির সুতোয় সত্য বয়ন করার তাঁতযন্ত্রে
বহু বছর ধরে বহু নকশা ফুটেছে একের পর এক
বন্দিশিবির হত্যাশিবির
রাষ্ট্রহীন শরণার্থীদের অভিশপ্ত খোঁয়াড়
(রাষ্ট্রহীনতাই নাকি অভিশাপ ?
রাষ্ট্রবান মানেই অস্তিত্ববান ?)
ছাইরঙ জেগেছে ক্রমে সবুজ ঢেকে দিয়ে
ক্লান্ত করেছে
তবু নেশা ধরিয়েছে যাত্রা-দুর্গমতার মাহাত্ম্য
মুঠোবন্দি বিশ্বাসগুলো সত্য রূপে অজেয় বোধ হয়েছে
ক্লান্তিকে গাল পেড়ে সমরসজ্জায় সেজে
সত্যের চাঁদমারি লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়েছি
আবারও অনন্ত বার

যুদ্ধের উদ্দেশ্য যুদ্ধ

যুদ্ধ কোনও জয় বা পরাজয়ে পৌঁছয় না
তবু আঁধার নামলে ছোট ছোট বিজয়োৎসব পালন হয়
রাস্তায় মানুষের ঢল নামে
পরের ভোরে ফের যুদ্ধশুরুর আগে নেশা-খোয়ারির অবসর
ঘাতকের চোখের মতো শীতল আলোয় সেজে ওঠে

নিসর্গ ৯:
যখন ঘৃণা সহজ

যখন ঘৃণা সহজ
দোয়েলপাখিরা উড়তে ভুলে যায়
আর ঠাসা জলসায়
লাউডস্পিকারের সামনে দাঁড়িয়ে গান গায়।
যখন ঘৃণা সহজ
ক্ষমাকে কেউ ক্ষমা করে না।
যখন ঘৃণা সহজ
নিঃসম্বলেরা রাজা হয়।
যখন ঘৃণা সহজ
প্রত্যেকেই গাল দেয় তাদের
যারা ঠিক তার মতো করে বাঁচে না।
যখন ঘৃণা সহজ
লোহার কাঠামো বেঁধে ঢালাই করে
আশার ইমারত গড়া হয়, আর
বন্দুকধারী প্রহরী বসানো হয় পাহারায়।
যখন ঘৃণা সহজ
সেই ইমারতের সবচেয়ে রোদ-পোহানো তলের
সবচেয়ে রোদ-পোহানো ঘরটা নরক হয়ে ওঠে।

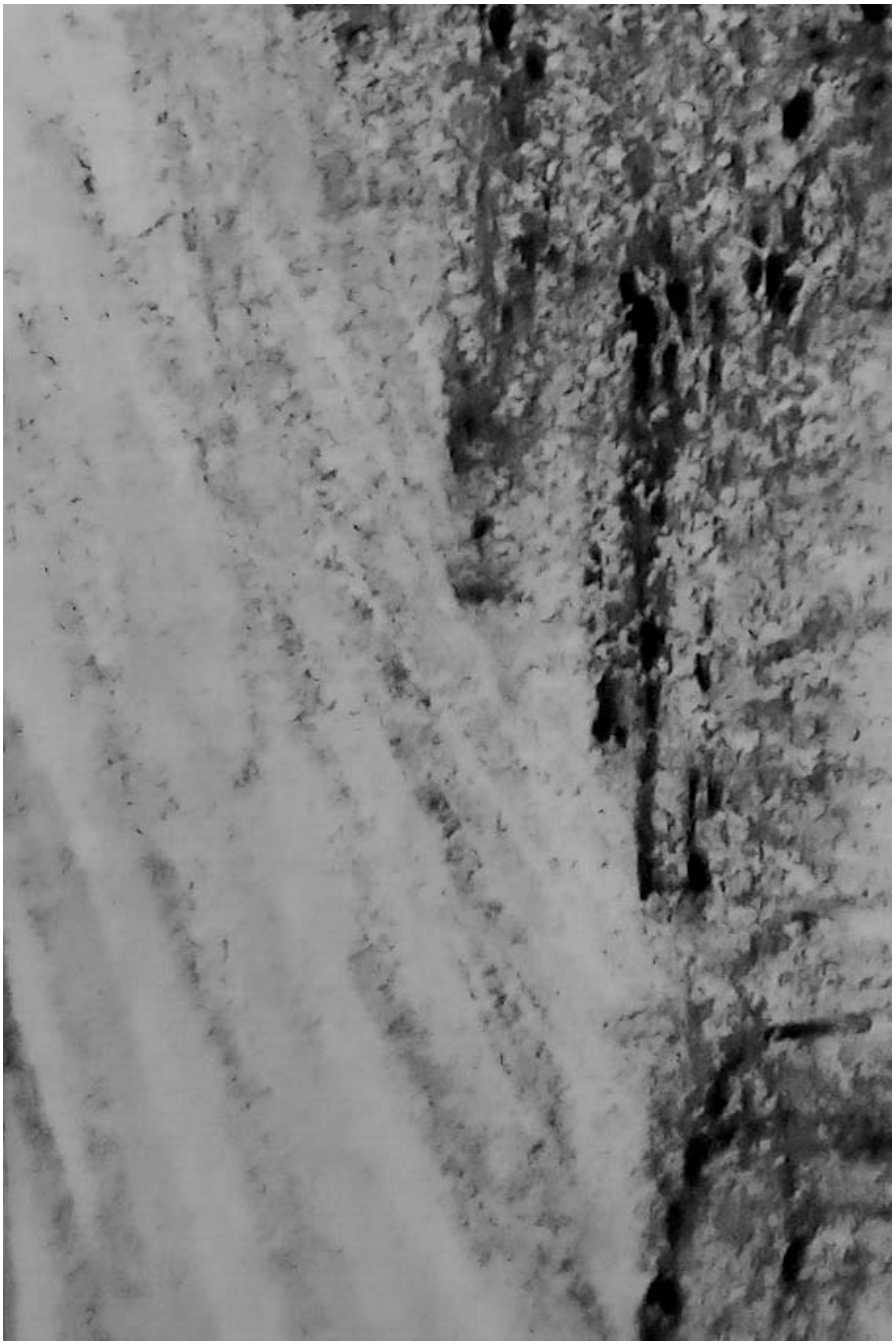

নিসর্গ ১০:
ইন্দ্রদুহিতা ও আমি

আসান-পাকুড় ছাওয়া
আরশিনগরের বন
জায়মান ভাবনায় ঘাসমাটির পথ
আর জন্তুলার থান

বাড়ি থেকে পালিয়ে
ইন্দ্রদুহিতা সেখানে অভিসারে আসত
অনার্য মায়ের গর্ভে পিতৃপরিচয়হীন
বড় বড় দুটো চোখে চেয়ে
দেখতে চাইত বাবরের প্রার্থনারত অবনতি
আলো গলে পড়ত গাল বেয়ে
অস্ফুট দেহ যৌনগন্ধী নয়
তবু পরাগকেশর কেঁপে উঠত

আমার তো তন্ত্রই সম্বল
বাবরপুত্রের শবের সঙ্গে নিষ্কাম যৌনাচার
অতিকথার স্নায়ুপথে ধাপকাটা উত্থান
ব্রহ্মতালুর উপর ঝুঁকে ইন্দ্রদুহিতার চোখে চোখ রাখা

দুজনার তালুতে অখণ্ড অনন্ত স্থাপিত
সময় পাশ দিয়ে বয়ে গেল

আরশিনগর পাল্টে গেছে
নরকের নিয়মে বন কেটে হয়েছে শহর পত্তন

মুশকিল আসানের জন্য আসানেরা কাটা পড়েছে
একটাই মাত্র পাকুড় পড়ে আছে
তার তলায় তামাক আর গর্ভনিরোধকের দোকান
যুক্তিবাঁধানো পাকা রাস্তার বেড়ি ছুটছে পাক খেয়ে
জন্তুলা এখন মাটির গর্ভে

এখন আরশিনগরের মোড় থেকে বাস ধরে
ইন্দ্রদুহিতা রোজ রাজদপ্তরে কাজ করতে যায়
তার স্ফূটযৌবনা দেহে তামাক-দোকান থেকে ছিটকানো দৃষ্টি লেগে থাকে
আর কাজ থেকে ফেরার পথে সে আমার টোলে আসে
ক্ষত্রিয় তন্ত্র বিশ্লেষণের কাজ কতটা এগোলো একনজর দেখে
তার মুখ হাসিতে বেঁকে ওঠে

নিসর্গ ১১:
স্বগতোক্তি

মেঘার্ত সময়ে বিজন অবসাদে
শোকের সারণি আমি তৈরি করব না।
অস্তিত্বের যন্ত্রণা হিঁচড়ে নিয়ে গেছে যে সব পাথরখণ্ডের উপর দিয়ে
সেসব কুঞ্চিত করে তোড়ায় বাঁধা আমার কাজ নয়।
অপারগ আমি।
ফুলদানিটা খালিই থাক।
পুরানো স্মৃতিমেদুর জামার ছেঁড়া হাতায় তালি-সেলাই করার মতো
অপসৃত দিগন্তের পাটভাঙা প্রান্ত থেকে
দ্রুতবেগ জীবনের উপর নজর বোলানো যাক।

অলিগলি, পিছ-উঠোন, পুরাতাত্ত্বিক প্রান্তর, মিনার ও পাঁচিল—
যেখানেই পথ থেমেছে আর ঘর বেঁধেছে,
সেখানেই স্বপ্ন ও প্রেম জরায় মৃত্যুতে শ্মশানে মুখ লুকিয়েছে—
রক্তবিহারমৃত্তিকার ধ্বংসাবশেষ বন্ধ্যা ও কদাকার হয়েছে শেষাবধি
যেখানেই বংশপত্তনের ক্রিয়াকল্পে শয্যা বিছানো হয়েছে।

যুদ্ধে পা হারানো সৈনিক যেমন অতীত সুখসময় রোমন্থন করে
আমরাও তেমন জন্মদিন ও বিবাহবার্ষিকী পালন করি।
অতিকথার ঢেউয়ে শক্তিসঞ্চয় করে যেসব বন্দুক
ক্ষমতার উৎস দখল করতে চেয়েছিল
নর্দমা ও খাল শববোঝাই করে
তারা কেবল দূষণ বাড়িয়েছে
আর বর্ষপঞ্জির বিরল মহোদয় রূপকথাকাররা
যন্ত্রবর্ধিত স্বরে বাতাসের সবকটা কম্পন অধিকারে নিতে চেয়েছে।

দিগন্তপ্রান্তে বসে স্মৃতিরোমন্থনে সেসবও কুয়াশাঘেরা নদীর মতো মোহময়
অসম্ভব প্রত্যাবর্তনের আকাঙ্খায় নসটালজিক,
রক্তক্ষতগুলো এখনও লাল ফুলের ভ্রম উৎপাদন করে।
মরণের পর বিবর্ণ মহাশিক্ষকরাএখনও
পাহাড়-জঙ্গল-নদী-সরোবরের চেয়ে জ্যান্ত বোধে পূজিত হয়
লাল মুরগির গলা কেটে রক্ত ছিটানো হয়
দূর উত্তর ও দূর পুবের পুরানো মিনার লক্ষ্য করে,
আর মুরগির পেট ফালি করে অন্ত্যস্থ অন্ত্রে ভবিষ্যৎ পড়া হয়।
অন্ধকার নেমে আসে— কোথাও মিঠে কোথাও কর্কশ—
বৃত্তগুলো গুটিয়ে আসে ফাঁদের মতো—
অর্গলভাঙা বাতাসে কেঁপে ওঠে দূরতম তারা।

স্রোতস্তব্ধ নদীর তলা থেকে মরা মছের দেহ ভেসে ওঠে ঝাঁকে ঝাঁকে
প্রেতাত্মাদের স্বর খনখন করে,
শবদেহের ওপরে রাখা গীতা এখনও শত্রুনিধনে উৎসাহিত করে
ইতিহাসের অপরিবর্তনীয় গতির পক্ষে দাঁড়ানোর দোহাই দেয়
আর উলঙ্গ ফকিরের দেহে নতুন রক্তক্ষত জন্ম নেয়।

মেঘার্ত অন্ধকারে শোকের সারণি আমি তৈরি করব না।
কেবল মন্ত্র, শিক্ষা, আশা সর্বৈব বর্জন করে
ভবিষ্যৎ নামক অতিকথাটিকে প্রত্যাখ্যান করে
ফুলদানিটা খালিই রাখব
আর এই কুঞ্চিত সময়ে গেঁথে থাকব
খসে পড়ার আগে অবধি।

নিসর্গ ১২:
বিষাদ অকারণ

ঘিঞ্জি গলির অন্ধকারে
ভোঁতা ইঁটের দেওয়াল ঘেঁষে
বাতিস্তম্ভের পাণ্ডুর আলো
অকারণ বিষাদের ঢেউয়ে
শুকনো পাতার মতো ভেসে বেড়ায় ।
স্বপ্নচারী ও মাতালরাও ভাসে
আর নিজেদের ভাবে
ভবিষ্যবন্দরের ঠিকানা লেখা
ঈশ্বরিক বাণিজ্যপোত ।
কোনও আগন্তুক যদি হঠাৎ হাজির হয়ে
অবাক কৌতূহলে
তার রাতক্যামেরা তাক করে ছবি তোলে
সে ছবিতে ঐতিহ্যশালী নিশান ঘিরে
মৃত মানুষদের ভিড় উপচে পড়বে
আর মাঝরাতের অন্ধকার
খানদানি সভাঘরের রোশনাই হয়ে যাবে ।
কেবল পাক দিয়ে ওঠা এক সিঁড়ির নীচে
শ্যাওলার মতো অন্ধকারে
ভঙ্গুর একটি মেয়ে মুখ গুঁজে বসে
মন খারাপের কারণ খুঁজে নাকাল হবে ।

নিসর্গ ১৩:
বিপাক

সত্য ও সুন্দরের পেলব রূপ কল্পনা করে
আমরা শিক্ষানবিশী নিয়েছিলাম ভাস্করপ্রাসাদে

কেউ বানিয়েছি স্মৃতিস্তম্ভ
কেউ বাতিদান
কারও হাত খোদাই করেছে শিলালিপি
কেউবা অতীত সব ভাস্কর্য খুঁটে খুঁটে অনুকরণ করে
অমরতা গড়েছি

তারুণ্য ব্যয় করে ফেলার পর আমরা বুঝেছিলাম
নির্মাণ ও সৃষ্টি দুটি বিপরীত ক্রিয়া

অতিকথার আলো নিভে আসার পর
ভাস্করপ্রাসাদের দেওয়ালগুলো ভেঙে পড়েছিল
অন্ধকার ছিল রুক্ষ
যাযাবরের তাঁবুতে আশ্রয় নিয়ে উপলব্ধি করেছিলাম
কিছুই শিক্ষা হয়নি

কাঁকড়ের সঙ্গে খাপ খেয়ে যাওয়ার পর
হাত ক্রমে শিকড় হয়ে উঠেছিল

চন্দ্রহীন এই প্রান্তরে পিঁপড়ের ঢিপির মতো পাথরগুলোয়

আমাদের বিস্রস্ত টুকরোগুলো কোথাও কোথাও আটকে আছে
তা দেখে পরিচিতেরা এখনও আমাদের স্মরণ করে
অস্তিত্বের এই নির্বন্ধতা থেকে অবশেষে আমরা বুঝেছি
সত্য ও সুন্দর পেলব নয়

নিসর্গ ১৪:
হেঁটমুণ্ড

নরম পশমের ভিতর অপসৃয়মান প্রাণ বিস্ময়ে বিপন্ন
গুলিবিদ্ধ কাঠবিড়ালির মতো শতাব্দী ঝরে পড়ে

কালো স্রোতের ফাঁকে কতিপয় মাছ ভেসে থাকে
আর আণবিক যুদ্ধযান তীক্ষ্ণ শিসে জল কেটে ছোটে

শীতঠোঁটের রক্তরেখা থেকে ভেসে ওঠে স্বীকারোক্তিধূম
প্রেক্ষাপটজুড়ে ভারী জুতোর কুচকাওয়াজ গায় অর্ধস্বর্গের গান

এই বৈলক্ষণ্যে আমি হলাম আমি আর বাস্তবতা হলো বাস্তবতা
ভুতুড়ে বাড়িতে রাত কাটিয়ে কিছু প্রমাণ করার দায় আমার নেই

উন্মাদমৃত্যুর কঠিন মুঠোয় জনপদ বন্দি
দরজা বন্ধ করলেও এখন কোনও অভ্যন্তর নেই

মৃত নদী-অরণ্য-পাহাড় আর সব শিকার -নিশানা
বিসরিত অপরাধভারে মাথা হেঁট করে দেয়

নিসর্গ ১৫:
পূর্বপ্রেম

তখন স্পষ্ট আলো ছিল চারদিকে
বেদেনীর কাছে শেখা কৌশলে
বিষধরকে কাবু করে তার বিষটা ঢেলে নিলাম
জাফরি কাটা নীল কৌটোয়
তারপর যখন অন্ধকার নামল
নিজের ভিতরে চেয়ে দেখলাম
নীল কৌটোর অভ্যন্তর দৃশ্যমান
নীলাভ নিশায় বিষতরলের ঢেউ ভাঙছে
জাফরির ফুটোগুলো আকাশের ছিদ্র
আর চৌকোণা এক ভাসমান পোতে
আমার প্রথম প্রেম আমার কাছে এসে বসেছে
দেবীমাতৃকার মতো উদার তার দেহে
সে আমায় আশ্রয় দিল সুখ দিল
তার দীর্ঘ চুল ফণা মেলে পাহারা দিল
চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগে সৃষ্টি হল
রাত্রি এক বৃক্ষের রূপ ধারণ করল
বিষতরলের ঢেউ বেদেনীমন্ত্রে জমাট হল
ঢেউখেলানো মাটির বাঁধনে বাঁধা পড়ল চরাচর
বৃক্ষতলে পূজারিণীর দল উর্বরার পুজো দিতে এল
বাঁধনহীন সঙ্গমযাপনের সেই সার্বজনীন পুজোয়
দেবীপুজোর হাড়িকাঠে
রাজবস্ত্র পরিয়ে শুদ্ধদেহে আমাকে স্থাপন করা হল

নিসর্গ ১৬:
বিস্মরণের স্মৃতিই গভীরতম

স্মরণাতীত বিস্মরণ নেমেছে দৃষ্টি ছেয়ে। তরল অন্ধকারের মতো। কোনও একাকীত্বই বিস্মরণের স্মৃতির চেয়ে গভীর নয়। বাজে পোড়া গাছটিও তা জানে। তবু শব্দ আর যতিচিহ্ন ব্যবহারের অভ্যাস স্বয়ংক্রিয় বাক্য রচনা করে যায়। কোনও কিছুই যা প্রকাশ করে না। আমার পুরুষত্ব ঝুলে থাকে পাকা ফলের মতো। মগজমহলে দোর্দণ্ড দানবদের সঙ্গে লড়াই করে যাই দেবতাদের পক্ষ নিয়ে। সব ধ্বনি আর চিৎকার কচুকাটা করে সাধু আনন্দ চিরতরে চলে গেছে বিদিশান্ধকারে। রক্তে বা রসে রোমশ মাংসল দেহখণ্ড ভিজে উঠলে তবু উত্তেজনা জাগে কখনও কখনও। কোনও এক ঘাটে কলার মান্দাসে আমার শবের অপেক্ষায় আমার বেহুলা বুঝি আজও অপেক্ষমান। খোলা আকাশে মোড়া, নজরদার দৃষ্টিতে বাঁধা, টিলা-ডুংরিতে অসমতল, সমতানে সাজানো, লিখিত সংলাপ সব কোরাসে উচ্চারিত হয়। হয়তো এটাই সেই গ্রন্থি, এটাই আমার বিবেক, এই নেশাগ্রস্ত জটমূল, মৃত আলোয় ভাস্বর। ক্ষমতামত্ত কুকুরগুলো হিংস্র নেকড়ে হয়ে ওঠে বাইরের রাস্তায়। ভিতরমহলে বিস্মরণের স্মৃতির চেয়ে গভীর কোনও একাকীত্ব নেই।

নিসর্গ ১৭:
আবাস

যন্ত্রলালিত যাপনমাটি শুকিয়ে বিস্মৃতির মতো ঝরে গেছে। দেওয়ালের ক্ষতগুলোয় ভিজে চষা মাটির মতো আতঙ্ক কালচে নীলাভ হয়ে উঠেছে। ধার করা ভাষার স্তূপ পিঁপড়ের বাসায় পরিণত হয়ে অহৈতুকী যাতায়াতে অর্থহীন। নানা যুদ্ধের আয়োজন আমাদের সভ্যতার প্রামাণিক অভ্যাস। গহনতল অবধি তারা শিকড় চারানো। তবু এ সবই ভ্রম। প্রশিক্ষিত হাতের কোপেও ভোঁতা কোদাল ঠিকরে ঠিকরে ফিরে এসে পরিহাস করে। দূরে ঢেউভাঙার আওয়াজ দুলে ওঠে। জাহাজঘাটায় ক্রীতদাস-ভর্তি জাহাজ এসে লাগল সবে। এবার সভ্যতা শুরু হবে।

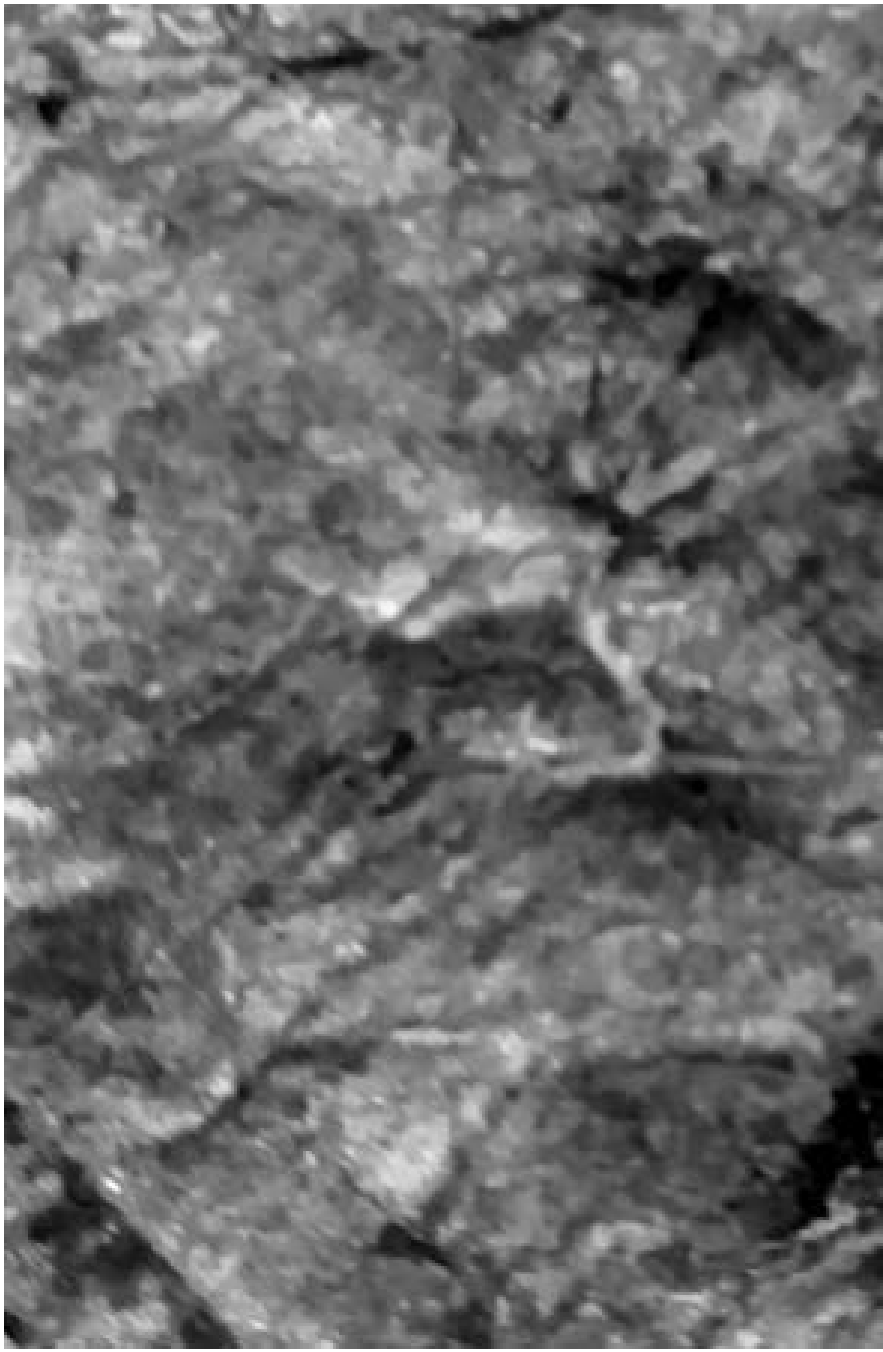

নিসর্গ ১৮:
একটি মৃত্যুর পর

একটি মৃতদেহকে ঘিরে জড়ো হয়েছিল কয়েকজন। ঘুমের মধ্যেই সে মারা গেছে। শেষ মুহূর্তে সে বেঁচে থাকার জন্য কোনো তীব্র চেষ্টা করেছিল কিনা জানা নেই। ঘুমের মধ্যে কোনও গোঙানি উঠেছিল কিনা তাও জানা আর সম্ভব নয়। বউ তার শুয়েছিল পাশেই: ঘুমোচ্ছিল, ঘুম ভাঙে নি। সেই শোয়ার ঘর ঘিরে জড়ো হয়েছিল সবাই। কারণ এটাই রীতি। শববাহী গাড়ির জন্য তাগাদা পাঠানো হয়েছিল। কয়েকজন গিয়েছিল ফুল-মালা-ধূপ কিনতে। বাকিরা অপেক্ষা করছিল। লাল চা খেতে খেতে। সিগারেট টানতে টানতে। টুকিটাকি আলাপ, ঠাট্টা-পরিহাস, কাজ বা অকাজের কথা চালাতে চালাতে সবাই অপেক্ষা করছিল দায়িত্ব মিটিয়ে যাওয়ার জন্য। কাঁচের গাড়িতে শব তুলে শ্মশানচুল্লিতে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব। আমাদের অস্থি-চর্ম এত অস্বচ্ছ হয়ে উঠেছে যে অভ্যন্তর অদৃশ্য। কোথাও অশ্রু নেই। বেদনা নেই। স্বাভাবিকতা ফেরার আগেই আবার সব স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল।

তার কয়েক দিন পর সভাকক্ষ। লাল কাগজের উপর সাদা অক্ষরে মৃত কিছু শব্দকে ছেপে চার দেওয়ালে লেপে ঘরটিকে অশরীরীময় করে তোলা হয়েছিল। ছিল মৃতের ছবি, ছবির গলায় মালা। সভামঞ্চে মৃতবৎ জীবন্তরা। তাদের কর্মতান্ত্রিকতার সদ্য অতীতে সদ্যমৃতজন কী উৎকৃষ্ট ব্যবহারে লেগেছিল, তার একঘেয়ে ধারাবিবরণী ছড়িয়ে পড়ছিল যান্ত্রিক স্বরবর্ধনে। মৃতকে ও মৃত্যুকেও ব্যবহার করতে তারা উঠেপড়ে লেগেছিল সংকীর্ণ কর্মতান্ত্রিকতার খাতে স্রোত-আবাহনী প্রতিবর্তক্রিয়ায়। সেই জীবন্মৃতদের সমাবেশে মৃত্যু কেমন ভোঁতা ও সোঁদা। সেই আপজাত্যের প্রদর্শনীতে মৃত্যুর অমোঘ বিস্ময়ও কেমন খর্ব বামনাকৃতি পুতুল !

তারও কিছু দিন পর তাড়নপর্দার উপরিভাগে কতকগুলি বৈদ্যুতিন আয়তক্ষেত্রের মধ্যে বন্দি মুখ মুখোমুখি হলাম স্মৃতিচারণায়। নসতালজিয়া-অধিগত কিছু মুহূর্তকে জীবন্ত দাবি করে খেলনা মৃত্যুর সঙ্গে কুমিরডাঙা খেলা হল। দেখা গেল কেউই একে অপরকে ছুঁতে পারে না। মৃত্যুকেও না। এভাবে বৈদ্যুতিন ছবিতে খর্বিত হয়ে গিয়ে বারবার একে অপরকে ছুঁতে চাওয়াটাও মূর্খতাবিশেষ বলে বোধ হচ্ছিল। যা সর্বব্যাপী, তা বোধের ওপারে চলে যায়: এখন মৃত্যুপরতাও তাই। রাত হয়ে এল। বৈদ্যুতিন সভা শেষ হল। পরদিন আবার আমাদের কাজ আছে। আমরা তো আর কেউ নচিকেতা নই।

নিসর্গ ১৯:
নদী আজ

কী নিদারুণ তমসাধর আজ কুমারী নদী!
পাথুরে হাঁটু গেড়ে জনপদ বিষাদমগ্ন দুই পারে,
আর নদীগর্ভে শিকারী জাল
কিরাতমুণ্ড নিয়ে হাজার আগুনের দাঁড় বেয়ে ছোটে
অপার্থিব শ্বাপদের মতো,
অথবা এটাই পার্থিব!
মৃত অরণ্যের আত্মারা বহু আগে
শেষবারের মতো জড়ো হয়ে
জলের বুকে নিজেদের প্রতিবিম্ব দেখে
শিউরে উঠে সরে গেছে দূরে,
হয়তবা প্রাগইতিহাসে!
ছায়াহীন অন্ধকারে ফুলে ওঠে কুমারী নদী,
লোহার সেতুথাম বেড় দিয়ে উলসে ওঠে,
লাস্যে বিষধর
হয়ত গান্ধারী সে!
রেলগাড়ির চেয়ে দীর্ঘ বিষণ্ণতা
ঝমঝমিয়ে বধির করে দেয়,
অনাঘ্রাত বিপর্যয়ে সেতু কেঁপে ওঠে ।

নিসর্গ ২০:
পতন

কোটালের ঢেউ আর অধিকৃত বন্দর আঁকা নিশান
ঝলক কাটে প্রাসাদ-গবাক্ষে

ফুসফুস-ভরা বায়ু সূর্যমুখী হয়ে
ভয়ানক সূর্যবহ্নির দিকে আহ্লাদী মুখ তোলে
আর আতুর যত স্বপ্ন
শূন্য চক্ষুকোটরতলে স্বচ্ছতোয়া নদী হয়ে যায়

কাঁপন দিয়ে জ্বর আসে
উপুড় করে ঢেলে দেয় কুয়াশা
খানিক রঙের পোঁছ রেখে বস্তু মুছে যায়
দ্রুতগামী ট্রেনের খোপে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে যেমন হয়

অন্তর্জালসভায় চিরকালীনতার বাস্তুকারদের সঙ্গে
যক্ষের প্রকৌশলী বোঝাপড়া পোক্ত হয়
আর পশ্চাদপট জুড়ে উজ্জ্বল পর্দায় ভেসে ওঠে
অলীক করঞ্জক রঙে স্ফূট ক্ষতের জ্যামিতিক চিত্রবিমূর্ত

পতন হয়
খাদে
একে একে
দুলতে দুলতে পতনশীল দেহগুলো দেখে

আকাশের উচ্চতা বেড়ে যাচ্ছে কেমন
প্রাসাদ ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হচ্ছে
আর স্পষ্টতর হয়ে উঠছে সমুদ্রতলে অপেক্ষারত ঘন গূঢ়ৈষা

নিষ্ক্রমণ

ভাবা মানে নিরাপত্তা ভেঙে অবিরত বিপদের পিছু ধাওয়া করা, সীমা লঙ্ঘন করা, মহিমময় তুচ্ছতার কাছে সত্য ও ন্যায়ের মহিমান্বিত নির্মাণগুলোকে বিসর্জন দেওয়া, মূর্তের প্রতি অতৃপ্তিতে বিমূর্ততার কারাগারে স্বেচ্ছায় বন্দি হওয়া, তাড়নাগ্রস্তের মতো জটিলতা খুঁড়ে বের করা, বেদনাকে পুজো করা। যে কোনও ধরনের সুস্থিতি ভাবার ক্ষমতাকে ধ্বংস করে।

ভাবনাকে কথায় বা রেখায় স্পর্শযোগ্য মূর্ত রূপ দেওয়ার চেষ্টাই লিখন। আপাতদৃষ্টিতে লিখন মানে তাই নিজেকে আহ্লাদে গ্রহণ করে অক্ষয় আত্মরূপ নির্মাণের চেষ্টা। কিন্তু এই আপাত ধারণাটি মিথ্যা বৈ সত্য নয়। লিখনের উন্মাদনা তখনই জাগে যখন কেউ নিজেকে আর গ্রহণ করতে পারে না, নিজেকে অপরিচিত আগন্তুক মনে হয়। সেই অপরিচয়ের গোপন কথাগুলো মুঠোয় ধরে ধ্বস্ত ও কলঙ্কিত করতে পারলে তবেই বুঝি নিস্তার। নিজেকে এভাবে ধ্বংস করাই লিখন। তা কোনও পাঠকের পাঠসুখের জন্য নয়। কোনও ভবিষ্যতের জন্য নয়। কোনও কিছুর জন্যই নয়।

আমার ভাষার এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত জুড়ে গোপনে কে বাস করে, বাকপটু কোন ঈশ্বরের শ্রুতি লিখিত হয়? আমি নয়, সে আমি নয়। আমার পাশেই কথা বলে চলে আরেক ভাষা, যা আমার অধিকারে নেই। একসময়ে যে ভাষায় আমি কথা বলেছিলাম, তা-ও এখন বেশ কিছুটা দূরে অপর হয়ে বিরাজ করছে, ক্রমশ নিস্তব্ধ হয়ে আসা এই পরিসরে ভারী পাথরের মতো ডুবে যাচ্ছে। ছিন্ন হয়ে, আবার যুক্ত হয়ে, বাদ পড়ে, আবার অন্তর্ভুক্ত হয়ে বহু স্বর নীরবতার দিকে যাত্রা করে— প্রাজ্ঞ বিষয়ীর স্বরে উন্মাদ কথা বলে। যে উচ্চতাভিলাষ থেকে ভাষার

পতন ঘটেছিল, সেই বিরল-বায়ু খাদের রেশ ধরে কথা হয়, কথা হয় ভাষার অবশ্যম্ভাবী ব্যর্থতা নিয়ে। শব্দেরা পাখা মেলেছিল, বাকপটু বিষয়ী হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে শুরু করেছিল— আর উপরপানে আটকে থাকা হাজারো দৃষ্টির সমুখে হুমড়ি খেয়ে পড়া সেই দৃশ্য ভাষার দৈন্য, ভাষার অমোঘ নীরবতা প্রদর্শন করেছিল।

চড়াই-উৎরাই মানচিত্রহীন বন্ধুর পথ পেরিয়ে শীর্ষের কাছে বিরল হয়ে আসবে বাতাস, নিঃশ্বাস আর প্রায় নেওয়াই যাবে না, আর নিঃশেষিত দেহ পতনসুখের টানে ঝুঁকে পড়বে খাদের কিনারে— বই তো এমন হতে হয়। স্পর্শনাগালের বাইরের সেই অনুপমকে ছোঁয়ার আপাত ব্যর্থ এক একটি যাত্রা মলাটবন্দি হয়ে স্রষ্টার থেকে নিজেকে পৃথক করে নেওয়ার মধ্য দিয়ে বই নাম নেয়।